মহাত্মা কবীরের অধ্যাত্মচেতনা

ভারতবর্ষে ভক্তির অলৌকিক ধারা নিত্যকাল থেকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। মধ্যযুগীয় সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা রোধে বিশেষ প্রয়াস দেখা গিয়েছিল স্বামী রামানুজাচার্য্যের মধ্যে। ভারতে ভক্তিলতার বীজ তিনিই বপন করেছিলেন। তাঁর এই প্রয়াসকে দীর্ঘায়িত করেছিল পরমভাগবত বৈষ্ণব চূড়ামণি স্বামী রামানন্দ ও তৎশিষ্য মহাত্মা কবীর।

একনিষ্ঠ ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভক্তি সাধনার দ্বারাই শ্রীভগবানের নিত্যলীলায় প্রবেশ করা যায় এবং অনন্তকাল নিজের অধিকার অনুসারে তাঁর সেবা করা ও লীলারস সম্ভোগ করা যায়। মহাত্মা কবীরের মতে এই পথে প্রবেশ করতে হলে সর্বপ্রথম পথপ্রদর্শকের অর্থাৎ সদ্‌গুরুর আশ্রয় একান্ত প্রয়োজন। জীব চেতনায় অবিদ্যাই আবরণ; শুদ্ধ বিদ্যার দ্বারা এই আবরণ নিবৃত্ত হয়ে জ্ঞানময়ী তনুর প্রকাশ ঘটে আর এই শুদ্ধবিদ্যা সদ্‌গুরুর কৃপাকটাক্ষ ব্যতীত পাওয়া যায় না। মহাত্মা কবীরজীর কথায়—

''সতগুরু সাঁচা সূরিয়া, লাতৈ লোহি লুহার।
কসনী দে কঞ্চন কিয়া, তাই লিয়া ততসার ॥''—

—''সদ্‌গুরুই সত্যরূপ সূর্য্য; যেমন তপ্ত লোহার প্রতি কামার, তেমন জ্ঞান অগ্নিতে তপ্ত করে তিনি হাতুড়ীর আঘাতে আঘাতে শিষ্যকে খাঁটি সোনায় পরিণত করে তত্ত্বমসী পদে স্থিত করে দেন।'' সত্যদর্শন ও জ্ঞান প্রকাশের জন্যে সাধকের অন্তরে অনিত্য জগতের প্রতি মনের গতিকে স্তব্ধ করতে এবং হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয়ের জন্যে সাধকদের প্রতি কবীর সাহেব ইঙ্গিত করলেন—

''রহনা নহিঁ দেস বিরানা হৈ।
য়হ সংসার কাগদ কী পুরিয়া, বুদ পড়ে ধূল জানা হৈ।
য়হ সংসার কাঁট কী বাড়ি, উলঝ-পুলঝ মরি জানা হৈ।
য়হ সংসার ঝাড় ঔর ঝাঁখর, আগ লগে বরি জানা হৈ।
কহত কবীর সুনো ভাই সাধো, সতগুরু নাম ঠিকানা হৈ।''—

—''এখানে থাকতে হবে না। এদেশ মরুভূমি। এ সংসার হল কাগজের পুরিয়ার মতন, তা ক্রমশঃ ধূলিতে মিশে যাবে। এই সংসার কণ্টকাকীর্ণ। এখানে জড়িয়ে পড়লে অবশেষে মরতে হবে। এ সংসার হল আগাছার ঝাড়ি, আগুন লেগে পুড়ে যাবে। তাই কবীরজী বলেছেন, ভাই সাধু শোনো, এ অবস্থায় সদ্‌গুরুর নামই একমাত্র গতি।'' মানুষকে অজ্ঞানান্ধকার থেকে মুক্তিলাভ করার জন্যে পবিত্র পয়গম্বর মহাত্মা কবীর বললেন যে ''সমস্ত ছেলেবেলাটা খেলা করে কাটিয়ে দিলে। যখন তরুণ হলে তখন হলে নারীর বশ। তারপর হলে বৃদ্ধ, তখন বাতে আর কফে ধরল এবং বিছানা নিলে। সদ্‌গুরু পাওনি বলে এত দুঃখ পেলে। তোমার এ দেহের বৈদ্য পেলে না। অন্তিমে মাতা-পিতা, বন্ধু, স্ত্রী-পুত্র কেউ তোমার সঙ্গে যেতে পারবে না। তাই যতদিন বাঁচবে আশ্রয় নেবে সদ্‌গুরুর।''

মহাত্মা কবীর

জীবনের শেষে যখন মৃত্যুর কোলে মানুষ ঢলে পড়ে তখন সে হয় বেহুঁশ; ঘোর অন্ধকারে তলিয়ে যায় তার চেতনা। তখন সেই তিমির নাশ করে একমাত্র সদ্‌গুরুই হাতে আলোর প্রদীপ নিয়ে পথ দেখানোর জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবেন। তখন মানুষ বোঝে সদ্‌গুরুর কী অপার মহিমা! তাই সদ্‌গুরুরূপী কবীর বলেছেন—

''সতগুরু কী মহিমা অনন্ত, অনন্ত কিয়া উপগার।
লোচন অনন্ত উঘড়িয়া, অনন্ত দিখাবনহার ॥'' —অর্থাৎ —''সদ্‌গুরুর অপার মহিমা, তিনি আমার অনন্ত উপকার করেছেন। তিনি আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলীত করেছেন যাতে আমি অনন্ত ব্রহ্মের প্রকাশকে প্রত্যক্ষ করতে পারি।''

''বলিহারী গুরু আপনৈ, দ্যৌহাড়ী কৈ বার
জিনি মানষি তৈঁ দেবতা, করত ন লাগী বার ॥''—

সদ্‌গুরুর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপিত করে কবীরজী বললেন, ''গুরুদেব আপনি ধন্য, আপনি আমাকে এক মুহূর্তে মানুষ থেকে দেবতা করে দিয়েছেন। আপনাকে প্রতিদিন বারংবার প্রণাম জানাই।''—

''কবীর গুরু গোবিন্দ্ দৌ খড়ে, কাকে লাগোঁ পায়।
বলিহারি গুরু আপনে, জিন্‌হ্ গোবিন্দ দিয়া মিলায় ॥
কবীর তে নর অধ হ্যায়, গুরু কো কহতে ঔর।
হরি রুঠে গুরু স্মরণ হ্যায়, গুরু রুঠে নহিঁ ঠোর ॥''—অর্থাৎ —''গুরু ও গোবিন্দ — দুইই উপস্থিত। এখন কাকে আগে প্রণাম করা উচিৎ? নিজের গুরু যিনি তাঁরই প্রশংসা করি,

কারণ, তিনিই দেখিয়ে দিয়েছেন গোবিন্দকে। যে গুরুকে ''গুরু'' না বলে অন্য কিছু বলে সে অধম। যদি ভগবান হরি রুষ্ট হন, তাহলে গুরুর আশ্রয় নেওয়া যায়। কিন্তু গুরু যদি রুষ্ট হন, তাহলে আর কোথাও নিস্তার নেই।''

ঈশ্বর রয়েছেন সর্বত্র। এই বিশ্বচরাচর তাঁর মন্দির। মানবের হৃদয়ও তাঁর মন্দির, সেখানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি হলে তখন আত্মদর্শন হয় এবং বিশ্বকে মনে হয় অতি আপনার। সে অবস্থায় আপন-পর ভেদাভেদ জ্ঞান হয় লুপ্ত। এই আত্মদর্শনের জন্য প্রয়োজন নীরব সাধনা, যা গুরুকৃপা ছাড়া একেবারেই অসম্ভব। সদ্‌গুরুর দর্শন পেলে মানুষের বহুজন্মের অবিদ্যাজনিত সংস্কার অপসারিত হয়। সদ্‌গুরুই হলেন একমাত্র ভগবান। সদ্‌গুরুর আশ্রয় ব্যতীত জীব একসঙ্গে অভিন্নভাবে ভোগ ও মোক্ষ, উভয় অর্জন করতে পারে না; অর্থাৎ, পূর্ণত্বলাভ করতে পারে না। ভোগ ও মোক্ষের সাম্যাবস্থাই হল জীবন্মুক্তি। সদ্‌গুরুপ্রাপ্তির মূলে ভগবদ্ ইচ্ছাই মুখ্য কারণ এবং জীবের ইচ্ছা এই মূল ইচ্ছারই অনুগামিনী। যিনি পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করে তাঁর সঙ্গে তদাত্ম্য প্রাপ্ত হননি, এমন তত্ত্বমাত্রের উপদেষ্টা আচার্য্য বিশেষকে ''অসদ্‌গুরু'' বলে। তাই মহাত্মা কবীর সাহেব বলেছেন, ''ভাই সাধু, সেই সৎগুরুকে আমার ভালো লাগে, যিনি সাচ্চা প্রেমের পেয়ালা ভরে ভরে নিজে খান আর আমাকেও খাওয়ান। যিনি চোখের পর্দা উন্মোচন করে দিয়ে ব্রহ্মদর্শন করান, যাঁর দর্শনে সমস্ত লোক-লোকান্তর দৃষ্ট হয়, অনাহত শব্দ শ্রুত হয়, একমাত্র সেই সদ্‌গুরুই দেখিয়ে দেন সুখ-দুঃখের রহস্য।'' তাই সদ্‌গুরুর প্রতি সদাই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার আদেশ দিয়েছেন কবীরজী।—

''কবীর গুরু মানুখ করি জান্তে, তে নর কহিয়ে অন্ধ।
ইহ দুঃখী সংসার মেঁ, আগে যমকো বান্দ্।।
কবীর গুরু মানুখ করি জান্তে, চরণামৃত কো পান।
তে নর নরক হি জায়েঙ্গে, জন্ম জন্ম হোয় শোয়ান্ ॥'—

অর্থাৎ —''গুরুকে যে মানুষ জ্ঞান করে, সে মানুষকে অন্ধ বলা যায়। এই সংসারেতে সেই দুঃখী এবং পরে সে যমের বন্ধনে পড়ে।'' কবীরজী বলেছেন, ''গুরুকে যে মানুষ ভেবে চরণামৃত পান করে, সেই মানুষ নরকে যাবে আর জন্ম জন্ম কুকুর যোনি লাভ করবে।''

সদ্‌গুরুর প্রসাদেই সাধক জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিলাভ করতে সমর্থ হয়। সাধকের উন্নত আধ্যাত্মিক উপলব্ধি লাভে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই ভক্তি কি?— ভাগবত প্রণেতা শ্রীব্যাসদেব বলেছেন, ''পূজাদিতে প্রগাঢ় প্রেমকেই ভক্তি বলে।'' মহর্ষি গর্গের ভাষায়, ''কীর্ত্তনাদিতে প্রগাঢ় প্রেমকেই ভক্তি বলে।'' শাণ্ডিল্য মুনির মতে, ''আত্মায় যখন তীব্র রতির উদ্ভব হয় তখন তাকে ভক্তি বলা হয়। অন্যভাবে, ঈশ্বরে অনুরক্তিই ভক্তি।'' পরবর্তীকালে বৈষ্ণব শিরোমণি স্বামী রামানুজাচার্য্য বলেন, ''স্নেহপূর্বক যে ভগবদ্ ধ্যান করা হয় তাকেই ভক্তি বলা হয়।'' শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র মতে, ''সর্ব উপাধি বিনির্মুক্ত অর্থাৎ সকল মায়িক ভেদশূণ্য ভগবান ব্যতীত অন্য বস্তুতে আসক্তি বর্জিত, তৎপরত্বে নির্মল অর্থাৎ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ যুক্ত হয়ে সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা হৃষীকেশ অর্থাৎ সর্বেন্দ্রিয়াধিপতি ভগবানের অনুশীলনই ভক্তি বলে কথিত হয়।'' শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, ''জীবের মনোগতি যখন বিনা ফলাকাঙক্ষায় ঈশ্বর কথা শ্রবণ মাত্রই ভেদদর্শন বিরহিত হয়ে সর্বান্তর্য্যামী পুরুষোত্তমে একান্ত ভাবে সন্নিহিত হয় তখনই নির্গুণ ভক্তি বা শুদ্ধভক্তির উদয় হয়।'' এপ্রসঙ্গে পরম ভাগবত মহাত্মা কবীর বলেছেন—

''কবীর কাজ ছরে নহিঁ ভক্তিবিন্, লাখ্ কথায়ে জো কয়ে।
শব্দ সনেহি হোয় রহে, খর্‌কো পহুঁচেয় শোয়ে।।''—

অর্থাৎ— ''বিনা ভক্তিতে কোন কাজই হয় না। লক্ষ লক্ষ কথা বলেও কিছু হয় না। ওঙ্কার ধ্বনিতে যাঁর অনুরক্তি জন্মেছে আর যিনি পৌঁছেছেন ঐ ওঙ্কার ধ্বনির ঘরে তারই সব হয়।''

''কবীর কহে পুকরি কৈ, ক্যা পণ্ডিত ক্যা শেখ।
ভক্তিহেতু শব্দ গহে, বহুরি না কাছৈ ভেখ ॥''—অর্থাৎ

—''কবীর উচ্চৈস্বরে বলেছেন পণ্ডিত ও শেখকে, ভক্তির জন্য ওঙ্কার ধ্বনিতে রত হও। তাহলে আর মিথ্যে কপালে তিলক ফোঁটা ও কৌপীন নিয়ে ভেক ধরতে হবে না।''

''কবীর কামী ক্রোধী লালচী, ইনহতে ভক্তি না হোয়।
ভক্তি করে কৈ শূরীয়াঁ, তন মন লজ্জা খোয় ॥''—অর্থাৎ

—''কামী, ক্রোধী ও লোভী, এদের ভক্তি হয় না। শরীর, মন, লজ্জা অতিক্রম করে কোন কোন শূর ভক্তি লাভ করে।''

''কবীর যব্ তব্ ভক্তি সকামতা তব্ তক নিহফল সেও।
কহ কবীর ওহো কোঁও মিলে, নিহংকামী নিজ দেও।''—

''কবীর সাহেব বলছেন, যতক্ষণ সকাম ভক্তি থাকবে ততক্ষণ সবই নিষ্ফল। নিষ্কামভাবে ভক্তি করলে নিজের দেবতাকে পাওয়া যায় অর্থাৎ যতক্ষণ কামনা থাকবে ততক্ষণ ভগবৎ প্রাপ্তি হয় না।''

সকামভক্তি নিষ্কামভক্তিতে রূপান্তরিত হলে হৃদয়ে

''প্রেম'' অবস্থার জাগরণ হয়। মহাত্মা কবীরের ওপর নারদ ও সুফী মতাবলম্বীদের বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাইতো কবীরের দোহায় 'প্রেম-পেয়ালা' 'ঈশ্‌ক' ও 'খুমার' শব্দগুলির অধিক ব্যবহার দেখা যায়। কবীরের ভক্তিতত্ত্বের মধ্যে প্রেমের স্পর্শ প্রিয়তম সাক্ষাৎকারের দ্বার খুলে দেয়। কবীর প্রেমের মধ্যে ত্যাগ ও তপস্যার বিশেষ জয়গান করেছেন। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

''ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা, রাগের স্বরূপ লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা এই তটসহ লক্ষণ ॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাঁহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান ॥''

ভাব বা রতি প্রেমের তরল বা অঙ্কুরাবস্থা। এর গাঢ় বা পক্কাবস্থাই হল প্রেম। প্রেম সূর্য্যের কিরণ সদৃশ বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ এবং রুচি দ্বারা চিত্তকে বিগলিত করে যে তত্ত্ব তাকেই ভাব বলে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কবীরজীও বলেছেন—

''কবীর প্রেম পিয়ালা সো পিয়ে, জো শীষ্ দচ্ছিনা দচ্ছিনা দেয়।
লোভী শীষ্ না দে সকে, নাম প্রেম কা লেয়।।''—অর্থাৎ—

—''প্রেমামৃত বাটি ভরে তিনিই পান করেন যিনি নিজের মস্তক শ্রীগুরুর চরণে নিবেদন করেন দক্ষিণাস্বরূপ। লোভী ব্যক্তি তা দিতে পারে না। সে খালি প্রেমের নামই মুখে বলে কিন্তু আসলে প্রকৃত প্রেমে উপনীত হয় না।''

''প্রেম প্রেম সবহিঁ কহে, প্রেম না চিন্‌হে কোয়।
জোঁহি ঘট প্রেমপিঞ্জর বসে, প্রেম কহাওয়ে সোয়।'' অর্থাৎ—

—''প্রেম প্রেম তো সকলেই বলে, কিন্তু প্রেম কেউ চেনে না। যাঁর দেহরূপ পিঞ্জরে বসেছে প্রেম, তারই প্রেম শোভা পায়।''

''কমোদিনী জলহরি বসৈ, চন্দা বসে অকাস।
জো জাহী কা ভাবতা, সো তাহী কৈ পাস ॥
কবীর গুরু বসৈ বনারসী, সিষ সমন্দা তীর।
বিসারয়া নহীঁ বিসরৈ, জে গুণ হোই সরীর ॥....
স্বামী সেবক একমত, মহ হী মেঁ মিলি জাই।
চতুরাঈ রীঝৈ নহীঁ, রীঝৈ মন কৈ ভাই ॥''—অর্থাৎ—

—''পদ্ম জলে থাকে আর চাঁদ আকাশে। যে যার প্রিয়, সে তার কাছেই বাস করে। যদি গুরু থাকেন বারাণসীতে আর শিষ্য থাকে সমুদ্রতীরে, একে অপরকে ভুলেও ভোলে না। ভগবান ও ভক্ত অভিন্ন, মনেতেই তাদের মিলন। চালাকিতে মিলন হয় না, মনের সহজতাতেই মিলন হয়।''

''ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ''তেও সাধকের প্রেমোদয়ের ক্রমের একই কথা বর্ণিত আছে। প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপর সাধুসঙ্গ, গুরুসঙ্গ তার থেকে ভজন ক্রিয়া, তার থেকে নাম স্মরণ, তার থেকে রুচি ও আসক্তি, এই পর্য্যন্ত সাধনভক্তি। এরপর ক্রমশঃ ভাব ও তার থেকে প্রেমের অভ্যুদয় হয়। শ্রীভগবানের সুমধুর নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি শ্রবণ করেও যাদের হৃদয় প্রেমভক্তিতে দ্রবীভূত হয় না—নেত্রে প্রেমাশ্রু, গাত্রে পুলকাবলীর উদয় হয় না, তাদের হৃদয় পাষাণতুল্য জড়বৎ, ভগবৎপ্রেম বিষয়টি তারা উপলব্ধি করতে পারে না।

কবীর দর্শনের মূল কথা হল, এ দুর্লভ মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যই হওয়া উচিত ঈশ্বরপ্রাপ্তি। তাই তিনি তাঁর রচিত দোঁহাবলীতে সদ্‌গুরুর মাহাত্ম্যকে কীর্ত্তন করেছেন। একমাত্র সদ্‌গুরুর প্রেমঘন কৃপাবর্ষণেই শিষ্যের গভীর ঈশ্বর-সাধনা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। সদ্‌গুরুর প্রসন্নতায় বর্ষিত হয় ভক্তি ও প্রেমের অমৃতরস। এই প্রেমভক্তির যুগল প্রসাদই ভক্তকে পৌঁছে দেয় করুণাময় পরমেশ্বরের ঘরে। মহাত্মা কবীরের এই 'সহজ সাধনা'ই তাই আজও সমাদৃত ভগবান সান্নিধ্যের পাথেয় রূপে।

—মাতৃচরণাশ্রিত শ্রীবরুণ দত্ত

জো কবিরা সূর্য্যকা রূপ সোই অবিনাশি ব্রহ্ম সোই হম। **—শ্রীশ্রী শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়**

সত্যযুগমে কবীর সাহেব কা নাম-সত্য সুকৃত; ত্রেতামে-মুনীন্দ্র; দ্বাপরমে-করুণাময়; কলিযুগমে কবীর।
—শ্রীশ্রী শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়